।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।।

তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন–ভগবন্ ! যদি জ্ঞানযোগই শ্রেষ্ঠ বলে আপনার অভিমত, তাহলে আপনি কেন আমাকে ভয়ঙ্কর কর্মে নিযুক্ত করছেন ? নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ অর্জুনের সরল বলে মনে হয়েছিল; কারণ জ্ঞানযোগে পরাজয় হলে দেবত্ব লাভ হয় এবং জয়ে মহামহিম স্থিতি- উভয় অবস্থাতেই মনে হয়েছিল লাভ। কিন্তু এখন অর্জুন উত্তমরূপে অবগত হয়েছেন যে, উভয়মার্গেই কর্ম করতে হবে। (যোগেশ্বর তাঁকে সংশয়শূণ্য হয়ে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিলেন; কারণ জ্ঞানলাভের স্রোত তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ।) অতএব উভয় পথের মধ্যে থেকে একটি নির্বাচনের পূর্বে তিনি নিবেদন করলেন–

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।

যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।১।।

হে কৃষ্ণ ! আপনি কখনও সন্ন্যাস অবলম্বন করে যে কর্ম করা হয় সেই কর্মের এবং কখনও নিষ্কাম দৃষ্টিদ্বারা যে কর্ম করা হয় সেই কর্মের প্রশংসা করছেন। উভয়ের মধ্যে আপনি যেটি উত্তমরূপে নির্দিষ্ট করেছেন, যেটি পরমকল্যাণকর তা আমাকে বলুন। দুটি পথ যদি একই জায়গায় পৌঁছোয়তাহলে আপনি সুবিধাজনক পথ কোনটি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন। যদি না করেন, তাহলে জানতে হবে যে, আপনি যাবেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎকর্মযোগো বিশিষ্যতে।।২।।

অর্জুন! সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক যে কর্ম করা হয় অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে যে কর্ম করা হয় এবং **'কর্মযোগঃ'**- নিষ্কামভাবে যে কর্ম করা হয়, উভয়ই পরমশ্রেয় প্রদান করে; কিন্তু তাদের মধ্যে সন্ন্যাস অথবা জ্ঞানদৃষ্টি প্রসূত কর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। এখন প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, শ্রেষ্ঠ কিরূপে?

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎপ্রমুচ্যতে।। ৩।।

মহাবাহু অর্জুন! যিনি বিদ্বেষ পোষণ করেন না, কিছুই আকাঙ্খা করেন না, তাঁকে সর্বদা সন্ন্যাসী বলে জানবে। তিনি জ্ঞানমার্গী অথবা নিষ্কাম কর্মযোগীই হোন না কেন। রাগ, দ্বেষাদি দ্বন্দ্বহীন সেই পুরুষ ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।। ৪।।

এই পথে যাদের জ্ঞান এখন অত্যল্প তারা নিষ্কাম কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয়কেই ভিন্নভিন্ন মনে করেন; কিন্তু পূর্ণজ্ঞাতা পণ্ডিতগণ এইরূপ মনে করেন না; কারণ উভয়ের মধ্যে একটিতেও উত্তমরূপে স্থিত পুরুষ উভয়ের ফলরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। উভয়ের ফল এক, সেইজন্য উভয়ই সমতুল বলে বিবেচিত হয়।

যৎসাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। ৫।।

সাঙ্খ্যদৃষ্টি ভাবাপন্ন কর্মযোগী যেখানে পৌঁছান, নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে যিনি কর্ম করেন, তিনিও সেই একই স্থানে পৌঁছান। সেইজন্য যিনি উভয়কেই ফলের দৃষ্টিতে এক দেখেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যদি উভয়েই একই স্থানে পৌঁছায়, তবে নিষ্কাম কর্মযোগ বিশেষ কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি।। ৬।।

অর্জুন! নিষ্কাম কর্মযোগের আচরণ ব্যতীত **'সন্ন্যাসঃ'**- অর্থাৎ সর্বস্বের ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া দুঃখপ্রদ। যখন যোগের আচরণ আরম্ভই হয়নি, তখন তা প্রায় অসম্ভব।

সেইজন্য যিনি ভগবৎ স্বরূপ মনন করেন তিনিই মুনি, যাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ মৌন, নিষ্কাম কর্মযোগের আচরণ করে শীঘ্রই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

স্পষ্ট হল যে, জ্ঞানযোগে নিষ্কাম কর্মযোগেরই আচরণ করতে হয়, কারণ দুটিতেই ক্রিয়া এক—সেই যজ্ঞের ক্রিয়া, যার শুদ্ধ অর্থ 'আরাধনা'। উভয় মার্গেই তফাৎ কেবল কর্তার দৃষ্টিকোণের। একজন নিজের ক্ষমতা বুঝে লাভ-লোকসান বিবেচনা করে এই কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং অন্যজন যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, তিনি ইষ্টের উপর নির্ভর করে এই ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তিগতভাবে পড়ে, অন্যজন সংস্থাগতভাবে। উভয়ের পাঠ্যক্রম এক, পরীক্ষা এক, পরীক্ষক-নিরীক্ষক উভয়েই এক। এইরূপ উভয়ের সদ্‌গুরু তত্ত্বদর্শী এবং উপাধি এক। কেবল পড়বার পদ্ধতি তাদের ভিন্ন। হ্যাঁ, সংস্থাগত ছাত্রের জন্য সুবিধা অধিক থাকে।

পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে কাম এবং ক্রোধ দুর্জয় শত্রু। অর্জুন! এদের তুমি বিনাশ কর। অর্জুনের মনে হল, এ-তো বড় কঠিন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন—না, দেহ থেকে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় থেকে শ্রেষ্ঠ মন, মন থেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ তোমার স্বরূপ। সেখান থেকেই তুমি প্রেরিত। এই প্রকার নিজের ক্ষমতা বুঝে, নিজের শক্তি সম্বল করে, স্বাবলম্বী হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া 'জ্ঞানযোগ'। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, চিত্তকে ধ্যানস্থ করে, কর্মগুলি আমাকে সমর্পণ করে আশা, মমতা এবং সন্তাপরহিত হয়ে যুদ্ধ কর। সমর্পণের সঙ্গে ইষ্টের উপর নির্ভর করে, সেই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্কাম কর্মযোগ। উভয়ের ক্রিয়া এবং পরিণাম এক।

এরই উপর জোর দিয়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন যে, যোগের আচরণ ব্যতীত সন্ন্যাস অর্থাৎ শুভাশুভ কর্মের সমাপ্তির স্থিতিলাভ অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে এরূপ কোন যোগ নেই যে, হাত গুটিয়ে বসে এটা বললেই যে- "আমি পরমাত্মা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, আমার কর্ম করবার প্রয়োজন নেই, আমার কোন বন্ধন নেই। আমি ভাল-মন্দ যা কিছু করি, তা' আমি করি না। ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত।"- এরূপ কপটতা শ্রীকৃষ্ণের শব্দে কোথাও নেই। সাক্ষাৎ যোগেশ্বরও নিজের অনন্য সখা অর্জুনকে কর্ম ছাড়া এই স্থিতি প্রদান করতে পারেননি। এরূপ করতে পারলে, গীতার প্রয়োজন কি ছিল? কর্ম করতেই হবে। কর্ম করেই সন্ন্যাসের স্থিতিলাভ করা সম্ভব এবং যোগযুক্ত পুরুষ শীঘ্রই পরমাত্মাকে লাভ করেন। এরূপ পুরুষের লক্ষণ কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।। ৭।।

'**বিজিতাত্মা**'-যিনি বিশেষরূপে দেহ জয় করেছেন, '**জিতেন্দ্রিয়ঃ**'- যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করেছেন এবং '**বিশুদ্ধাত্মা**'- যাঁর অন্তঃকরণ বিশেষরূপে শুদ্ধ, এরূপ পুরুষ '**সর্বভূতাত্মভূতাত্মা**'- সম্পূর্ণ ভূতপ্রাণির আত্মার মূল উদ্‌গম পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত এবং যোগযুক্ত হন। তিনি কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না। তাহলে করেন কে? অনুগামীদের মধ্যে পরমকল্যাণকর বীজের সংগ্রহের জন্য। কেন লিপ্ত হন না? কারণ সম্পূর্ণ প্রাণিগণের যিনি মূল উদ্‌গম, যাঁর নাম পরমতত্ত্ব, সেই তত্ত্বে তিনি স্থিত হয়ে গেছেন। এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, যার খোঁজ করা হবে। যাবতীয় বস্তু যেগুলি ত্যাগ করে এসেছেন, সে সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে, তাহলে আসক্তি কার উপর করবেন? সেইজন্য তিনি কর্মে আবদ্ধ হন না। এটাই যোগযুক্তের শেষ সীমা। পুনরায় যোগযুক্ত পুরুষের স্থিতি স্পষ্ট করছেন যে, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত থেকেও তাতে লিপ্ত হন না কেন?–

নৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশঞ্জিঘ্রন্নশ্নন্‌গচ্ছন্‌স্বপন্‌শ্বসন্।। ৮।।

প্রলপন্বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।। ৯।।

পরমতত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎসহিত অনুভুত যোগযুক্ত পুরুষের মনের স্থিতি অর্থাৎ অনুভুতি এই যে, আমি কিঞ্চিন্মাত্রও করি না। এটা তাঁর কল্পনা নয়, বরং এই স্থিতি তিনি কর্ম করে লাভ করেছেন। যথা '**যুক্তো মন্যেত**'- এখন প্রাপ্তির পর তিনি সমস্ত কিছু পশ্যনে, শ্রবণে, স্পর্শণে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রায়, বায়ু গ্রহণে, চক্ষুর উন্মেষ এবং নিমেষেও 'ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত', এইরূপ ধারণাযুক্ত হন। পরমাত্মা থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, এবং যখন তিনি সেই পরমাত্মাতেই স্থিত, তখন তার থেকে শ্রেষ্ঠ কোন্ সুখের কামনা করে তিনি কারও স্পর্শ ইত্যাদি করবেন? যদি এর থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু থাকত, তাহলে আসক্তি অবশ্যই হত। কিন্তু প্রাপ্তির পর এখন এগিয়ে যাবেন কোথায়? এবং কি ত্যাগ করবেন? সেইজন্য যোগযুক্ত পুরুষ লিপ্ত হন না। একেই একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করলেন–

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।। ১০।।

পদ্ম ফুলের জন্ম কাদায় হয়, পদ্মপাতা জলে ভাসতে থাকে। তরঙ্গ রাত-দিন তার উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করে; কিন্তু এর পাতা দেখবেন শুকনোই থাকে। জলের একটা বিন্দুও তার উপর স্থির হতে পারে না। জল এবং পাঁকের মধ্যে থেকেও পদ্মপাতা তাতে লিপ্ত হয় না। সেইরূপ যে পুরুষ সমস্ত কর্ম পরমাত্মাতে বিলয় করে (সাক্ষাৎকারের সঙ্গেই কর্মের বিলয় হয়, এর পূর্বে নয়), আসক্তি ত্যাগ করে (কারণ এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, অতএব আসক্তিও থাকে না, সেই জন্য আসক্তি ত্যাগ করে) কর্ম করেন, এইরূপ তিনিও লিপ্ত হন না। তাহলে তিনি করেন কেন? আপনাদের জন্য, সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য, অনুগামীদের পথ দেখানোর জন্য। এই প্রসঙ্গেই জোর দিলেন—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।। ১১।।

যোগীগণ কেবল ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং দেহের আসক্তি ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন। কর্ম ব্রহ্মে লীন হওয়ার পরেও কি আত্মা অশুদ্ধ থাকে? না, তিনি 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা' হয়ে যান। সকল প্রাণীর মধ্যে তিনি নিজের আত্মাকে ব্যাপ্ত দেখেন। সেই সকল আত্মার শুদ্ধির জন্য, আপনাদের সকলের পথ-প্রদর্শনের জন্য তাঁরা কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন। দেহ, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তিনি কর্ম করেন। তাঁর স্বরূপ কোন কর্ম করে না, স্থির থাকে। বাইরে থেকে দেখে তাঁকে সক্রিয় মনে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরে অসীম শান্তি প্রবাহিত থাকে। যেমন পোড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা যায় না, শুধু আকারটুকু বাকী থাকে।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।। ১২।।

'যোগযুক্ত' অর্থাৎ যিনি যোগের ফললাভ করেছেন, সেই পুরুষ সকল প্রাণীর আত্মার মূল পরমাত্মা যিনি, তাঁতে স্থিত, এইরূপ যোগী কর্মের ফলত্যাগ করে (কর্মফল পরমাত্মা এবং তিনি ভিন্ন নন, সেইজন্য এখন কর্মফল ত্যাগ করে) '**নৈষ্ঠিকীম্ শান্তিম্ আপ্নোতি**'- শান্তির অন্তিম অবস্থা লাভ করেন, যারপর আর কোন শান্তি লাভ করা

বাকী থাকে না অর্থাৎ তিনি আর কখনও অশান্ত হন না। কিন্তু অযুক্ত পুরুষ, যিনি যোগের পরিণামের সঙ্গে যুক্ত নন, পথিক- এরূপ পুরুষ ফলে আসক্ত হয়ে (ফল হলেন পরমাত্মা, তাঁতে আসক্ত হওয়া আবশ্যক, সেইজন্য ফলে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও) **'কামকারেণ নিবধ্যতে'**- কামনা করে আবদ্ধ হন অর্থাৎ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কামনাগুলি জাগে, অতএব সাধককে চরম অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। 'মহারাজজী' বলতেন, "হো! তনিকৌ হম অলগ, ভগবান অলগ হ্যাঁয়, তো মায়া কাময়াব হো সকতী হ্যায়।" কালকে লাভ হবে তবুও আজ তো সে অজ্ঞানীই। অতএব পূর্তিপর্যন্ত সাধকের অসাবধান হওয়া উচিত নয়। এই প্রসঙ্গেই দেখুন—

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্।। ১৩।।

যিনি সম্পূর্ণরূপে স্ব-বশে, যিনি কায়, মন, বুদ্ধি এবং প্রকৃতির ঊর্ধ্বে স্বয়ং-এ স্থিত, এরূপবশী পুরুষ নিঃসন্দেহে নিজে কিছু করেন না এবং কাউকে কর্মে প্রবর্তিতও করেন না। অনুগামীদের দিয়ে করালেও তাঁর আন্তরিক শান্তিকে কিছু স্পর্শ করতে পারে না। এরূপ স্বরূপস্থ পুরুষ শব্দাদি বিষয়গুলিকে যে নবদ্বারের মাধ্যমে অনুভব করেন, সেই নবদ্বার (দুটি কান, দুটি চোখ, দুটি নাসিকা ছিদ্র, একটা মুখ, উপস্থ এবং পায়ু) যুক্ত দেহরূপ গৃহে সমস্ত কর্ম মন থেকে ত্যাগ করে স্বরূপানন্দেই স্থিত থাকেন। বাস্তবপক্ষে তিনি কিছু করেন না এবং করানও না।

পুনরায় একেই শ্রীকৃষ্ণ অন্য শব্দে বলেছেন যে, সেই প্রভু নিজে কিছু করেন না, কাউকে কোন কর্মে প্রবর্তিতও করেন না। সর্দগুরু, ভগবান, প্রভু, স্বরূপস্থ মহাপুরুষ, যুক্ত ইত্যাদি একে অন্যের পর্যায়। আলাদাভাবে কোন ভগবান কিছু করবার জন্য আসেন না। যখন কিছু করেন, তখন এই স্বরূপস্থ ইষ্টের মাধ্যমে করান। মহাপুরুষের জন্য দেহ গৃহমাত্র, অতএব পরমাত্মা করুন অথবা মহাপুরুষ, একই ব্যাপার; কারণ তিনি তাঁদের মাধ্যমে করেন। বস্তুতঃ সেই পুরুষ করেও কিছুই করেন না। এই প্রসঙ্গেই এর পরের শ্লোকটি দেখুন—

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।। ১৪।।

সেই প্রভু ভূতপ্রাণীগণের কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফলের সংযোগ সৃষ্টি করেন না; বরং স্বভাবে যে প্রকৃতির চাপ সেই অনুসারেই সকলেই প্রবর্তিত হয়। যার যেমন প্রকৃতি- সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক, সেই স্তর থেকেই সে প্রবর্তিত হয়। প্রকৃতি তো বিস্তৃত, কিন্তু আপনার উপর ততটাই প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যতটা আপনার স্বভাব বিকৃত অথবা উন্নত।

প্রায়ই লোকে বলে যে, কর্ম করেন-করান ভগবান, আমরা তো যন্ত্রমাত্র। আমাদের দিয়ে তিনি ভাল করান অথবা মন্দ। কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, প্রভু স্বয়ং কিছু করেন না, কাউকে দিয়ে করানও না এবং জোগাড়ও করে দেন না, লোকে স্বভাবে স্থিত প্রকৃতির চাপ অনুসারেই আচরণ করে। স্বত-ই কার্য করে। তারা নিজের স্বভাবের জন্য করতে বাধ্য হয়, ভগবান করেন না। তাহলে লোকে বলে কেন যে, ভগবান করেন? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর বলছেন–

নাদত্তে কস্যচিৎপাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।। ১৫।।

যাঁকে আগে প্রভু বলা হয়েছে, এখানে তাঁকেই বিভু বলা হ'ল, কেননা তিনি সম্পূর্ণ বৈভবযুক্ত। প্রভুতা এবং বৈভবে সংযুক্ত সেই পরমাত্মা কারও পাপকর্ম অথবা কারও পুণ্যকর্ম গ্রহণ করেন না তবুও লোকে বলে কেন? এই কারণে যে অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হয়ে। আছে তাদের এখনও প্রত্যক্ষ গোচরীভূত যে জ্ঞান, তা হয়নি। তারা এখনও জন্তু। মোহবশতঃ যা কিছু বলতে পারে। জ্ঞানদ্বারা কি হয়? একে স্পষ্ট করলেন–

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।। ১৬।।

যাঁদের অন্তঃকরণের সেই অজ্ঞান (যার দ্বারা জ্ঞান আবৃত ছিল) আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে এবং যিনি উপর্যুক্ত রূপে জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর সে জ্ঞান সূর্যের মত পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে। তাহলে কি পরমাত্মা অন্ধকারের নাম? না, তিনি তো 'স্বয়ং প্রকাশরূপ দিন রাতী'- স্বয়ং প্রকাশমান। আছেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের উপভোগের জন্য নয়, দেখা তো যায় না? যখন জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান অপসারিত হয়, তখন সেই জ্ঞান সূর্যের মত পরমাত্মাকে নিজের

মধ্যে প্রবাহিত করে দেয়। তখন তাঁর জন্য কোথাও অন্ধকার বলে কিছু থাকে না। সেই জ্ঞানের স্বরূপ কি?–

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।। ১৭।।

যখন সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মার অনুরূপ বুদ্ধি হয়, তত্ত্বের অনুরূপ প্রবাহিত মন হয়, পরমতত্ত্ব পরমাত্মাতেই নিরন্তর স্থিতি এবং তৎপরায়ণ হয়, একেই জ্ঞান বলে। জ্ঞান তর্কের বিষয় নয়। এই জ্ঞানদ্বারা পাপমুক্ত পুরুষ পুনরাগমন মুক্ত পরমগতি লাভ করেন। পরমগতি প্রাপ্ত, পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকেই পণ্ডিত বলে। আরও দেখুন-

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। ১৮।।

জ্ঞানদ্বারা যাঁদের পাপ বিনষ্ট হয়েছে, যাঁরা ‘অপুনরাবর্তী পরমগতি’ লাভ করেছেন, এইরূপ জ্ঞানীগণ বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালে, গরু, কুকুর ও হাতীতে সমদর্শী হন। তাঁদের দৃষ্টিতে বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে কোন বিশেষত্ব হয় না এবং চণ্ডালের প্রতি কোন হেয়ভাব হয় না। তাঁদের দৃষ্টিতে গাভী ধর্ম নয়, কুকুর অধর্ম নয় এবং হাতির মধ্যেও কোন বিশেষত্ব নেই। এরূপ পণ্ডিত, জ্ঞাতাগণ সমদর্শী এবং সমবর্তী হন। তাঁদের দৃষ্টি চর্মে নয়, আত্মাতে পড়ে। পার্থক্য কেবল এতটাই বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন স্বরূপের কাছে হন এবং বাকী যারা, তারা কিছু দূরে থাকে। কেউ একস্তর উপরে, কেউ একস্তর নীচে থাকে। দেহটা তো বস্ত্র। তাঁদের দৃষ্টি বস্ত্রকে গুরুত্ব দেয় না বরং তাদের হৃদয়ে স্থিত আত্মাতে পড়ে। সেই জন্য তাঁরা পার্থক্য করেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যথেষ্ট গোসেবা করেছিলেন। তাঁকে গাভীর প্রতি গৌরবপূর্ণ শব্দ বলা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি সেরূপ কিছু বলেননি। শ্রীকৃষ্ণ গাভীকে ধর্মে কোন স্থান দেন নি। তিনি কেবল এইটুকু স্বীকার করেছিলেন যে, অন্য আরও জীবাত্মার মত তাদের মধ্যেও আত্মা বিদ্যমান। গাভীর আর্থিক মহত্ব যা হোক না কেন, তাদের ধার্মিক বৈশিষ্ট পরবর্তী মানুষেরা জোর করে চাপিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ গত অধ্যায়ে বলেছেন যে, অবিবেকীদের বুদ্ধি অনন্ত ভেদযুক্ত হওয়ার জন্য তারা অনন্ত ক্রিয়ার বিস্তার করে নেয়। অনর্থক শোভাযুক্ত বাণীতে তারা সে সমস্ত ব্যক্তও করে। তাদের বাণীর

প্রভাব যাদের চিত্তের উপর পড়ে, তাদের বুদ্ধিও নাশ হয়। কিছু লাভ হয় না, বরং অনেক কিছু লোকসান হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগে অর্জুন! নির্ধারিত ক্রিয়া একটাই–যজ্ঞের প্রক্রিয়া 'আরাধনা'। গাভী, কুকুর, হাতী, অশ্বত্থ, নদীর ধার্মিক মহত্ব এই অনন্ত শাখাযুক্ত অবিবেকীদেরই সৃষ্ট। যদি এগুলির ধার্মিক মহত্ব থাকত, তাহলে তা' শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই বলে থাকতেন। হ্যাঁ মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি পূজার স্থানের প্রয়োজন সাধনার আরম্ভিক কালে অবশ্যই থাকে। সেখানে প্রেরণাদায়ক সামূহিক উপদেশ পাওয়া যায়, তার উপযোগিতা অবশ্যই আছে, এগুলি ধর্মোপদেশ কেন্দ্র।

প্রস্তুত শ্লোকে দুইজন পণ্ডিতের উল্লেখ করা হয়েছে। একজন পূর্ণজ্ঞাতা এবং অন্যজন বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন। কিরূপে তাঁরা দুজন? বস্তুতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর সীমা দুটি –অধিকতম সীমা পরাকাষ্ঠা এবং প্রবেশিকা অথবা নিম্নতম সীমা। উদাহরণস্বরূপ ভক্তির নিম্নতম সীমা সেখানে, যেখান থেকে ভক্তি আরম্ভ করা হয়; বিবেক-বৈরাগ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে যখন আরাধনা করা হয় এবং অধিকতম সীমা সেটা, যেখানে ভক্তি পরিণাম দেওয়ার স্থিতিকে থাকে। ব্রাহ্মণ শ্রেণীতেও এইরূপ হয়। যখন ব্রহ্মে স্থিতিলাভের ক্ষমতা চলে আসে, তখন বিদ্যা, বিনয় স্বাভাবিক ভাবে সাধকের মধ্যে পাওয়া যায়। মনে শান্তভাব, ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, অনুভূতির সঞ্চার, ধারাবাহিক চিন্তন, ধ্যান এবং সমাধি ইত্যাদি ব্রহ্মে স্থিত হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা তার অন্তরালে স্বাভাবিকভাবে কার্য করে। একে ব্রাহ্মণত্বের নিম্নতম সীমা বলে। যখন ক্রমশঃ উন্নত হতে হতে ব্রহ্মের দিগ্‌দর্শন করে সাধক তাঁতেই বিলীন হন, তখন উচ্চতম সীমা উপস্থিত হয়। যাঁকে জানবার জন্য সাধনারত ছিলেন, তাঁকে লাভ করে তিনি পূর্ণজ্ঞাতা হন। অপুনরাবৃত্তিযুক্ত এরূপ মহাপুরুষ সেই বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, কুকুর, হাতী, গাভী সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হন, কারণ তাঁর দৃষ্টি হৃদয়স্থিত আত্মস্বরূপে পড়ে। এরূপ মহাপুরুষ পরমগতি লাভ করে কি পেয়েছেন এবং কিরূপে? এর উপর আলোকপাত করে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।। ১৯।।

সেই পুরুষগণ জীবিত অবস্থাতেই সম্পূর্ণ সংসার জয় করেন, যাঁদের মন সমভাবে স্থিত। মনের সমভাবের সঙ্গে সংসার জয় করার কি সম্বন্ধ? সংসার লুপ্ত হওয়ার পর সেই পুরুষ থাকেন কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, '**নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম**'-

সেই ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম হন, এদিকে সেই পুরুষের মনও নির্দোষ ও সমস্থিতি যুক্ত হয়ে যায়। **'তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ'**- সেইজন্য তাঁরা ব্রহ্মে স্থিত হতে পারেন। একেই অপুনরাবর্তী পরমগতি বলে। এটা কখন লাভ হয়? যখন সংসাররূপ শত্রুকে জয় করে নেওয়া হয়। এই সংসারকে কখন জয় করা সম্ভব হয়? যখন মন নিরুদ্ধ হয়, সমভাবে স্থিত হয় (কারণ মনের প্রসারই জগৎ)। যখন তাঁরা ব্রহ্মে স্থিত হন, তখন ব্রহ্মবিদের লক্ষণ কি? তাঁদের অবস্থিতি স্পষ্ট করলেন—

ন প্রহৃষ্যেৎপ্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।

স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ।। ২০।।

তাঁর প্রিয়-অপ্রিয় বলে কেউ থাকে না। সেইজন্য সাধারণ লোকে যাকে প্রিয় বলে মনে করে, তাকে পেয়ে তিনি উৎফুল্ল হন না এবং যাকে লোকে অপ্রিয় বলে ভাবে (যেমন ধর্মাবলম্বী প্রতীকরূপে ব্যবহার করেন) তাকে পেয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হন না। এরূপ স্থিরবুদ্ধি, **'অসংমূঢ়'**- সংশয়শূণ্য, **'ব্রহ্মবিদ্'**- ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত, ব্রহ্মবেত্তা **'ব্রহ্মণি স্থিতঃ'**- পরাৎপর ব্রহ্মে সদৈব স্থিত থাকেন।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।। ২১।।

বাহ্য সংসারের বিষয়-ভোগে অনাসক্ত পুরুষ অন্তরাত্মাতে স্থিত যে সুখ বিদ্যমান, সেই সুখলাভ করেন। সেই পুরুষ **'ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা'**- পরব্রহ্ম পরমাত্মায় মিলিত হয়ে যুক্তাত্মা হন, সেইজন্য তিনি অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন, যে আনন্দ কখনও ক্ষয় হয় না। এই আনন্দ উপভোগ কে করতে সমর্থ? যিনি বাহ্য বিষয় ভোগে অনাসক্ত। তাহলে কি ভোগ বাধক? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।

আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।। ২২।

কেবল ত্বক্‌ই নয়, সকল ইন্দ্রিয় স্পর্শ করে। দেখা—চোখের স্পর্শ, শোনা—কানের স্পর্শ। এই প্রকার ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বিষয়সমূহের সংযোগে উৎপন্ন সকল ভোগ যদ্যপি ভোগকালে সুখদায়ক বলে মনে হয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে সে সকল **'দুঃখযোনয়ঃ'**- দুঃখদায়ক যোনির কারণ। এই ভোগই যোনিগুলির কারণ। তাই শুধু

নয়, ভোগের কামনা মনে জাগে এবং কামনা পূরণের পর তা নাশ হয়ে যায়, ভোগ নাশবান্। সেইজন্য কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ তাতে আবদ্ধ হন না। ইন্দ্রিয়সমূহের এই স্পর্শে কি থাকে? কাম এবং ক্রোধ, রাগ এবং দ্বেষ। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ।

কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।। ২৩।।

সেইজন্য যে মনুষ্য দেহ বিনাশের পূর্বেই কাম এবং ক্রোধ থেকে উৎপন্ন বেগ সহ্য করতে (নাশ করতে) সক্ষম হন, তিনি নর (যিনি রমণ করেন না।)। তিনিই এই লোকে যোগযুক্ত এবং সুখী। এর পর আর দুঃখ নেই, সেই সুখে অর্থাৎ পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করেন। জীবিত অবস্থাতেই এর প্রাপ্তির বিধান, মৃত্যুর পর নয়। সন্ত কবীর এই বিষয়ে স্পষ্ট বলেছেন- '**অবধু! জীবত মে কর আশা**।' তাহলে কি মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ হয় না? তিনি বলেছেন- '**মুএ মুক্তি গুরু কহে স্বার্থী, ঝুঠা দে বিশ্বাসা**।' এই কথন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরও যে, দেহ থাকতেই, মৃত্যুর পূর্বেই যিনি কাম-ক্রোধের বেগ নাশ করতে সক্ষম, সেই পুরুষ এই লোকে যোগী, তিনিই সুখী। কাম, ক্রোধ, বাহ্য স্পর্শই শত্রু। এদের জয় করুন। এইরূপ পুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে পুনরায় বলছেন—

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি।। ২৪।।

যিনি অন্তরাত্মাতেই সুখী, '**অন্তরারামঃ**'- অন্তরাত্মাতেই প্রশান্তচিত্ত এবং যিনি অন্তরাত্মাতেই প্রকাশমান (যিনি সাক্ষাৎকার করেছেন) সেই যোগী '**ব্রহ্মভূতঃ**'- ব্রহ্মে একীভূত হয়ে '**ব্রহ্মনির্বাণম্**'- বাণীর ঊর্ধ্বে যে ব্রহ্ম, সেই শাশ্বত ব্রহ্মকে লাভ করেন। অর্থাৎ সর্বপ্রথম বিকারসমূহের (কাম-ক্রোধের) অন্ত, তারপরে দর্শন এবং শেষে প্রবেশ। আরও দেখুন—

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।। ২৫।।

পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করে যাঁদের পাপ নাশ হয়েছে, যাঁদের সংশয় নষ্ট হয়েছে এবং সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত (যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরাই এরূপ

করতে পারেন। যারা গর্তে পড়ে আছে, তারা কি অন্যকে বাইরে বার করবে? সেইজন্য মহাপুরুষগণের স্বাভাবিক গুণ করুণা) এবং **'যতাত্মানঃ'**- জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ শান্ত পরব্রহ্মকে লাভ করেন। সেই মহাপুরুষের স্থিতির উপর পুনরায় আলোকপাত করলেন–

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্।। ২৬।।

কাম এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত, যিনি চিত্ত জয় করেছেন, যিনি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করেছেন, সেই জ্ঞানীপুরুষগণ সর্বদিক্ থেকে শান্ত পরব্রহ্মকে লাভ করেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বার বার সেই পুরুষের স্থিতির উপর জোর দিচ্ছেন যাতে প্রেরণা লাভ করে সাধক এতে প্রবৃত্ত হন। প্রশ্নটি প্রায় সম্পূর্ণ হল। এখন তিনি পুনরায় জোর দিচ্ছেন যে, এই স্থিতিলাভ করবার আবশ্যক অঙ্গ হল 'প্রাণ-অপানে (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে) চিন্তণ'। যজ্ঞের প্রক্রিয়াতে প্রাণের অপানে আহুতি, অপানের প্রাণে আহুতি, প্রাণ এবং অপান উভয়ের গতি কিরূপে নিরুদ্ধ করতে হয় বলেছেন। সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন–

স্পর্শান্‌কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।। ২৭।।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।। ২৮।।

অর্জুন! বাহ্য বিষয়, দৃশ্যগুলির চিন্তন না করে, সেগুলি ত্যাগ করে, দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থির করে, 'ভ্রূবোঃ অন্তরে'এর অর্থ নয় যে, নেত্রদ্বয়ের মধ্যে অথবা ভ্রূযুগলের মধ্যেই কোথাও দেখবার চিন্তা করে দৃষ্টি স্থির করবেন। ভ্রূযুগলের মধ্যের অর্থ এটাই যে, সোজা হয়ে বসলে দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যে দিয়ে যেন সোজা সম্মুখে পড়ে। কখনও ডানদিকে, কখনও বাঁদিকে, এদিক্-ওদিক্ অস্থির দৃষ্টি যেন না হয়। নাকের অগ্রভাগে সোজা দৃষ্টি স্থির করে (নাক যেন নজরে না পড়ে), নাকের মধ্যে যে প্রাণ এবং অপান বায়ু বিচরণ করে, সেই বায়ু সমান করে অর্থাৎ দৃষ্টি সেখানে হবে এবং স্মৃতি শ্বাসে যুক্ত করতে হবে, সে শ্বাস কখন ভিতরে যায়? কতক্ষণ থাকে? (প্রায় আধ সেকেণ্ডের মত থাকে, জোর করে বেশীক্ষণ শ্বাসবন্ধ

রাখা উচিত নয়।) কখন বাইরে আসে? বাইরে কতক্ষণ থাকে? বলবার দরকার নেই যে, শ্বাসে যে নামধ্বনি হয়, তা শুনতে পাওয়া যাবে। এইভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যখন স্মৃতি স্থির হবে, তখন ধীরে ধীরে শ্বাস অচল, স্থির হয়ে যাবে, সম হয়ে যাবে। মনে কোন সংকল্পের উদয় হবে না এবং বাহ্য কোন সঙ্কল্প অন্তরে প্রবেশ করে মনকে নাড়া দিতেও পারবে না। বাহ্য ভোগ সমূহের চিন্তন বাইরেই ত্যাগ করে দিলে অন্তরেও সঙ্কল্প জাগবে না। স্মৃতি একদম স্থির হয়ে যাবে, তৈলধারার সদৃশ। তৈলধারা জলের মত বিন্দু বিন্দু পড়ে না, যতক্ষণ পড়ে ধারাতেই পড়ে। এইরূপ প্রাণ ও অপানের গতি সমান, স্থির করে ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং বুদ্ধি যিনি জয় করেছেন; ইচ্ছা, ভয় এবং ক্রোধরহিত, যিনি মননশীলতার চরমসীমায় পৌঁছেছেন, এরূপ মোক্ষপরায়ণ মুনি সদা 'মুক্ত'। মুক্ত হয়ে তিনি কোথায় যান ? কি লাভ করেন ? এই প্রসঙ্গে বলছেন-

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।। ২৯।।

সেই মুক্ত পুরুষ আমাকে যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের ঈশ্বরের ঈশ্বর, সকল প্রাণীর স্বার্থরহিত হিতৈষী সাক্ষাৎ এইরূপ জেনে শান্তিলাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সেই পুরুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা আমি। যজ্ঞ এবং তপস্যা অবশেষে যার মধ্যে বিলীন হয়, সে আমি। সেই পুরুষ আমাকে লাভ করেন। যজ্ঞের শেষে যার নাম শান্তি তা' আমারই স্বরূপ। সেই মুক্ত পুরুষ আমাকে জানেন এবং জানবার পর আমাকেই লাভ করেন। একেই শান্তি বলে। আমি যেমন ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সেইরূপ তিনিও।

নিষ্কর্ষ –

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কখনও আপনি নিষ্কাম কর্মযোগের এবং কখনও সন্ন্যাস মার্গ অনুসারে যে কর্ম করা হয়, তার প্রশংসা করছেন, অতএব উভয়ের মধ্যে যেটা আপনি চূড়ান্ত বলে নির্দিষ্ট করেছেন, যা' পরম কল্যাণকর, তা আমাকে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন- অর্জুন ! দুটিই পরমকল্যাণকর। উভয় মার্গেই নির্ধারিত যজ্ঞের প্রক্রিয়াই সম্পাদন করা হয়; কিন্তু তবুও নিষ্কাম কর্মযোগ বিশিষ্ট। এর অনুষ্ঠান না করলে সন্ন্যাস (শুভাশুভ কর্মগুলি শেষ) হয় না।

সন্ন্যাস পথের নাম নয়, গন্তব্যের নাম সন্ন্যাস। যিনি যোগযুক্ত, তিনিই সন্ন্যাসী। যোগযুক্তের লক্ষণ বললেন যে, তিনিই প্রভু। তিনি কিছু করেন না, কাউকে দিয়ে কিছু করানও না, বরং স্বভাববশতঃ প্রকৃতির চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে মানুষ নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত থাকে। যিনি সাক্ষাৎ আমাকে জানতে পারেন, তিনি জ্ঞাতা এবং পণ্ডিত। যজ্ঞের পরিণামে পুরুষ আমাকে জানতে পারেন। প্রাণ-অপানে জপ এবং যজ্ঞ-তপস্যা যাঁর মধ্যে বিলীন হয়, সে আমি। যজ্ঞের পরিণামস্বরূপ আমাকে জানবার পর তাঁরা যে শান্তি লাভ করেন, তা'ও আমি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাপুরুষের মত স্বরূপ তাঁরাও লাভ করেন। তিনিও ঈশ্বরের ঈশ্বর, আত্মারও আত্মস্বরূপময় হয়ে যান, সেই পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হন (এক হতে যতগুলি জন্মই লাগুক না কেন।)। বর্তমান অধ্যায়ে স্পষ্ট করলেন যে, যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, মহাপুরুষেরও অন্তরে বিদ্যমান শক্তি মহেশ্বর, অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে "যজ্ঞভোক্তামহাপুরুষস্থ মহেশ্বরঃ" নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।।৫।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'যজ্ঞ ভোক্তা মহাপুরুষস্থ মহেশ্বর' নামক পঞ্চম অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থ গীতা' ভাষ্যে 'যজ্ঞভোক্তা মহাপুরুষস্থ মহেশ্বরঃ' নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।।৫।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে যজ্ঞভোক্তা মহাপুরুষস্থ মহেশ্বর' নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।